ANJANI

Gargi Bhattacharya

****

Copyrighted material

অঞ্জনী

গার্গী ভট্টাচার্য

এই গল্পগুলি পুরো কাল্পনিক। বাস্তবের সাথে কোনো মিল নেই ।

কোথাও কোনো মিল পেলে বুঝবেন তা নেহাৎ-ই কাকতলীয় ।

My website ::

www.gargiz.com

“ পাঠকদের ২০২১ এর খ্রীস্টমাস উপহার “

অঞ্জনী

পূর্ব ভারতের কোনো এক বনজ এলাকার মেয়ে অঞ্জনী । সে আদতে উপজাতির কন্যা । তার জাতির নাম কহর । তাদের পেশা ছিলো চাষবাস ও গালা উৎপন্ন করা । সেই গালা দিয়ে নানান প্রকার শিল্প, চুড়ি ও ওষুধ তৈরি হতো ওদের এলাকাতে ও পরে বিক্রি করতো ওরা । এইভাবেই চলতো । এছাড়া অনেক অনেক যুগ আগে ওখান দিয়ে নাকি হনুমান সেই গন্ধমর্দন পর্বত নিয়ে যাবার সময় কিছু ভেষজ সমেত একটি খরগোশ পড়ে যায় তাই ওখানে অঢেল মহৌষধের ভান্ডার । আর খরগোশের পতনের ফলে সেখানে গড়ে ওঠে একটি মন্দির । পশুর মন্দির । বিরাট একটি পাথরের খরগোশ পুজিত হয় প্রতি অমাবস্যায় । সেই পুজোয় খরগোশ বলি দেওয়া হয় ।

দেবতার নাম ছেল্লাম । এই দেবতা নাকি এই উপজাতির রক্ষক । আর এই ভেষজের কল্যাণে সমস্ত রোগভোগ সেরে যায় । এলাকার হাওয়া বাতাসও খুবই স্বাস্থ্যকর । কারণ সেই হনুমানের গন্ধমর্দন পর্বতের ঐশ্বরিক স্পর্শ ।

ফিরে আসি বর্তমানে ।

এখানে এখন গালা নিয়ে ভালো কাজ হয় । বেশ বড় বড় কারখানা আছে । তারই একটাতে কাজ করে অঞ্জনী । সে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে । ওদের পরিবারে সবথেকে শিক্ষিত সে । কিন্তু ওর একটা আজব স্বপ্ন আছে । আর পাঁচটা আদিবাসী রমণী যারা পরিবারে সর্বপ্রথম শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছে তাদের মতন সে ওখানেই আটকে না গিয়ে একা সারা ভারত ঘুরে দেখতে চায় । বিশেষ করে যেতে চায় ভূস্বর্গ গান্ধারে । ভারতের মাথায় যে মুকুটের মতন আছে কাশ্মীর যা স্বর্গ বলে পরিচিত সেরকম আছে এক নগর গান্ধার, যা মধ্য ভারতে। কিন্তু সেখানে আজ আর কেউ যায়না। ওদের রাজ্য বলেনা , বলে ইউনিয়ন টেরিটরি । এই স্থানের কথা অনেক শুনেছে । কিন্তু পড়শী রাজ্য মোহনভোগের সাথে ক্রমাগত ঝামেলা চলে বলে ওখানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব বলেই কেউ যায়না। এই জন্মে হয়ত

বা আর ওখানে যাওয়া হবেনা ।আর ও জানেনা যে আবার এই গ্রহে সে আসবে কিনা । কাজেই স্বপ্ন সত্যি হবার আশা খুবই কম । কিন্তু স্বপ্ন একটা আছে । কেউই আর ওখানে যায়না । ব্যাপারটা ঠিক মাওবাদী ঘটিত নয় তবে কিছুটা ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে । হিংস্রতা আছে তবে উগ্রপন্থা নয় ।

মোহনভোগ রাজ্যের আছে নিজস্ব ধর্মীয় সেনা । তারা চায়না যে গান্ধারের মানুষ অন্য কোনো ধর্ম মানুক । মোহনভোগের মানুষ, ভারতে খুব অল্প সংখ্যক লোক যারা ভগবান বিষ্ণুর মোহিনী রূপের পুজো করে । মন্দির আছে ঐ ঠাকুরের । বিরাট উৎসব হয় । অনেক গান্ধারের বাসিন্দাও এই পুজো করে । তাই মোহনভোগ চায় যে গান্ধারের ক্ষুদ্র অংশটি ওদের রাজ্যের সাথে জুড়ে দেওয়া হোক্ । কিন্তু সরকার তা চাননা । এই উদ্ভট দাবী কেউ মানবে না ।

তার কারণ প্রথমত: এইভাবে সবার দাবী মানলে দেশ টুকরো টুকরো হতে বেশিদিন লাগবে না । দ্বিতীয়ত এটা দুনিয়ার স্বর্গ বলে চিহ্নিত না হলেও টুরিস্ট স্পট বলে বেশ একটা ইজ্জৎ ও আয়ের কারণ । আর গরীবের স্বর্গ বলে পরিচিত । অনেকে একে দরিদ্রের সুইজারল্যান্ড বলে থাকে । কাজেই স্বতন্ত্র একটি স্থান

হিসেবে নানান সুবিধে আছে । অন্য একটি রাজ্যের অঙ্গ হলে অনেক অসুবিধেও হবে ইত্যাদি কারণে রাজা উজিরেরা রাজি নন এই জোড়া দেওয়াতে যদিও ভাঙার থেকে গড়াই বেশি উপাদেয় । তাই লোকে আপাততঃ এই গরীবের আম খাওয়া থেকে বঞ্চিত ।

****

অঞ্জনী একদিন সুপার মার্কেট থেকে বাড়ি ফিরছে ।

ও যাকে বিয়ে করবে তার নাম হনুমান । মানব দেহধারী এই মর্কট কাজ করে এই মার্কেটে-- তাকে নিয়ে ওরা বাড়ি ফিরছে । ওর একটি পা নেই । আগে একটি ব্যাঙ্কে সিকিউরিটির কাজ করতো । সেখানে লুটপাটের সময় পা জখম হয় ও পরে কাটা পরে । তবে তাতে বিয়ে বন্ধ হবেনা । কারণ ওরা শৈশব থেকে একে অপরকে চেনে । আর ওদের বিয়েও স্থির হয় ওদের প্রথা মেনে তখনই । ওদের জাতিতে ছোট থাকতেই বিয়ে স্থির হয়ে যায় । কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে বিয়ে, মৃত্যু এগুলো ধর্মীয় ব্যাপার আর মানুষের আওতার বাইরে । তাই কেউ যদি খঞ্জ স্বামীর উপযুক্ত হয় তাহলে তাকে সেই পতিকেই গ্রহণ করতে হবে ।

তার আর কোনো উপায় নেই । ধর্ম ওদের জীবন । এমনই আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছে ওদেরকে যে মানুষের সুখ দু:খের থেকে ধর্মের নিষ্প্রাণ অস্তিত্বই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ! কাজেই মানুষের ইচ্ছে বা সুবিধে অসুবিধের থেকে ধর্মের লাল চোখই বেশি দাদাগিরি করে ওখানে ।

মাঝে মাঝে অঞ্জনীর মনে হয় যে মেয়ে হয়ে জন্মানো মনে হয় এক ধরণের পাপ ।

কেউ যদি মনের কোমলতা মেনে চলে ও দয়ামায়া দেখায় তাহলে কি তার জন্য ঈশ্বর নামক অদেখা শক্তি তাঁর দরজা খুলবেন না ? নিজের সমস্ত ইচ্ছেকে দমন করে ; **মেন্টাল** হয়ে জীবন কাটিয়ে কোন অমৃত লাভ করবে মানুষ ? কিন্তু তার কথা শোনার বা বোঝার মতন কেউ তার কমিউনিটিতে নেই । হয়ত বা কোথাও নেই । তাকে উন্মাদ বলবে । স্টোন থ্রো করবে । মাথায় ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে তুলে এলাকার বাইরে পাঠিয়ে দেবে । গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দেবে কিংবা চাবকে পিঠের ছাল তুলে নেবে । কাজেই মৌনতা সম্মতির লক্ষণ নাহলেও এক্ষেত্রে নিরুপায় হয়েই এমন ব্যবহার । ও তো আর বিপ্লবী নয় ! অত শক্তি তো ভগবান ওকে দেননি !

****

বাসায় ফেরার সময় হোয়াটস্ অ্যাপে একটি মেসেজ দেখলো । গান্ধার নামক ইউনিয়ন টেরিটরিতে, রাজা উজিরেরা সবাইকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে দিয়েছেন । ওখানে কেউ আর মোহিনী অবতারের পুজো করবে না । কারণ ভগবান বিষ্ণুই তো মোহিনীর আসল রূপ ! কাজেই ওনার অর্চণাই হবে ওখানে আর তাতে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মোহনভোগ আর কোনো গোলমাল করতে সক্ষম হবেনা ঠাকুর দেবতার ব্যাপার স্যাপার নিয়ে ।

শুনে খুব অবাক হল অঞ্জনী । হনুমানকে হেসে বলে ওঠে-- শেনয় সিং রাঠোর ইজ গ্রেট । দেখো এই মেসেজটা দেখো !

হনুমান কিছু বুঝতে পারেনা । কারণ শেনয় সিং রাঠোর অর্থাৎ গান্ধারের নতুন রাজা একটু কমবয়সী তরুণ তূর্কী ধরণের মানুষ বলে অনেকে ওনাকে সমালোচনা করে বলে থাকেন যে উনি একটু চটপট সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত । উনি হঠাৎ এমন কি ভালো কাজ করে অঞ্জনীর মন জয় করে ফেললেন তা হনুমানকে অবাক করলেও

প্রিয়ার পরশ থেকে বঞ্চিত হতে চায়না বলে হানু (ওকে ওর হবু স্ত্রী এই বলেই ডাকে) হাত বাড়িয়ে বলে--দাও । মোবাইলটা নিতে গিয়ে ওকে একটু স্পর্শও দেয় । বোনাস্ । মেসেজটা পরে এই সংক্রান্ত ভিডিওটা দেখে । বলে ওঠে, বেশ মজার ব্যাপার তো !

পুরো একটা অঞ্চলের উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্তন করা সহজ নয় । অনেকে ওনাকে হয়ত বা ডিক্টেটর বলবে । অনেকে ঘৃণার চোখেও দেখবে ধর্মীয় বিষয়ে আঘাত করার জন্য । কিন্তু একটা বিরাট উপকার তো হল ! অনেক দিনের একটা পুরনো সমস্যা যার জন্য এত মানুষের জীবন হানি হচ্ছিলো এত যুগ ধরে ; তা বন্ধ হল এবং জায়গাটা আস্তে আস্তে আবার দর্শনীয় স্থান হিসেবে গড়ে উঠবে , বাড়বে লোকাল মানুষের জীবন ধারণের জন্য আয়ের উৎস । শিল্প । চাকরি । যা এতদিন স্তব্ধ হয়ে ছিলো ।

ভদ্রলোক র‍্যাডিক্যাল নেতা নিঃসন্দেহে । ধীরে ধীরে হয়ত সব ঠিক হয়ে যাবে । প্রথমটায় একটু মেনে নিতে কষ্ট হলেও সবুরে তো মেওয়া ফলে।কাজেই পরে ভালো কিছু আশা করা যায় । অন্তত: হানাহানি কমবে । অঞ্জনী বলে ওঠে, উনি নাস্তিক হলেও ওনার জন্য ঈশ্বরের দুয়ার খোলা ।

মোহনভোগ রাজ্য অবশ্যি পরে আর ঝামেলা করেনি কারণ মোহিনীর স্রষ্টা তো ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং কাজেই ওরা ভেবে নিয়েছে এটা শ্রী নারায়ণের অন্তরের ইচ্ছেতেই হয়েছে।

লাল চাউমিন

একজন ডনের নাম লাল চাউমিন । এর ভয়ে সারা পূর্বাঞ্চল কম্পমান । এই মাফিয়ার সাথে নাকি ফার ইস্টের যোগাযোগ আছে । এমনকি এই লোকটি অ্যাফ্রিকার নানান অপরাধীদের সাথেও কাজ করে ।

কেন এর নাম লাল চাউমিন তা কেউ জানেনা ।

তবে এর কিন্তু অনেক সাদা ব্যবসাও আছে যার লোগো-টা লাল রং এর চাউমিনের মতন। যেমন ফুড প্যাকেজিং, পোশাক আশাক , কসমেটিক্স, হোটেল ইত্যাদি । আবার নানান দানধ্যানও করে থাকে। তার মধ্যে যেমন আছে অনাথালয় , স্কুল, বিধবা আশ্রম , বৃদ্ধাশ্রম , চিকিৎসালয় ও ফ্রি খাবার জায়গা । এখানে

কিন্তু লোকটি কোনো প্রকার দু নম্বরী করেনা । নিজেই বলে -- আমার এক হাত দুনম্বরী করে অন্য হাত বিলায় । দুনিয়া সোজা জায়গা নয় । সাদাকালো দাবা খেলাতেই ভালো লাগে । মানুষের জীবন ধূসর মেঘে ঢাকা । আমি যদি খাপ খুলি, ইয়া ইয়াদের লেংটি খুলে যাবে ! আগে খুঁজে বার করুন ডার্ক নেটের স্রষ্টা কোন মানুষ । সে তো কোনো সাধারণ , মূর্খ ক্রিমিন্যাল হতে পারেনা ।

আমি যা করার বন্দুক ধরে করি । কালা যাদু করে কারোর জন্ম জন্মান্তরের সর্বনাশ করিনা ।

লোকটি দূর্ধর্ষ দুশমন ! আরাবল্লীর নাহলেও রীতিমতন হিংস্র ও ভয়াল । লোলজিহ্বা দিয়ে যেন ঝরে পড়ছে ক্রমাগত তাজা মানব রক্ত ! রক্ত পিপাসু এই দানবের যতই দয়ালু একটি মন থাকনা কেন পুলিশ কি আর তাকে ছাড়ে ? তবুও বহুবার চেষ্টা করেও তাকে ধরা যায়না ।

অপারেশান বাটারফ্লাই , অপারেশান লাল স্প্যাগেটি , ব্লু বার্ড ফিশ্ , সবই ফেল । বহু পুলিশ কর্মী ও আন্ডার কভার এজেন্ট মৃত ।

শেষমেশ যদিও তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেও বা এক দুঁদে অফিসার --কিন্তু সে বেঁচে যায় !

সত্যি কি কোনো ভালো কাজের ফল সে পেয়ে যাচ্ছে প্রতিবার ? কারণ সব তো সাদা কালো নয় !

এবার তার বুকের বাঁ দিক তাক করে গুলি করলেও দেখা যায় একটি অত্যন্ত আজব ব্যাপারের শিকার সে । কম মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় এমন একটি জিনিস হল dextrocardia, বুকের ডান দিকে হার্ট এবং এক্ষেত্রে এই মাফিয়ার হার্টটি বুকের বামদিকে না হওয়ায় এই যাত্রাতেও বেঁচে যায় সে ।

হতাশায় ভেঙে পড়েন পুলিশ চিফ্ গগন সিং ।

মুখ বেঁকিয়ে বলে ওঠেন ,বাস্টার্ড কতদিন আর তুই বাঁচবি ? এবার তোকে আমি ফালাফালা করে দেবো । তোর শরীরের একটা প্রোটনও আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেনা ।

ইউ উইল বি ফাক্ড অ্যান্ড চপড্ ।

ওড়না

ভ্রমর পালের বাবা ছিলো কুমোর । কিন্তু কোনো স্বপের কারণে লোকটি কেবল কালীপুজোর সময় ডাকিনী ও যোগিনীর মূর্তি গড়তো । আর কোনো ঠাকুর গড়তো না । অন্যসময় একটি গ্রামের স্কুলে আর্ট টিচারের কাজ করতো । তাই ভ্রমরদের সংসার চলতো ঢিমেতালে । অভাবের শেষ ছিলোনা । তবুও মায়ের নিপুন সংসার চালোনায় সেটা বোঝা যেতোনা ।

এহেন মেয়েটি একটা সময় বাণিজ্য বিভাগে গ্রাজুয়েট হয়ে কস্ট ও ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন হয় ।

পরে একটি রং এর সংস্থায় বেশ কিছুদিন কাজ করে ।

নাম শুনে বোঝা যায় যে মেয়েটির রং ছিলো মেঘের মতন । তাই চিরটাকাল সে শুনে এসেছে নানারকমের গঞ্জনা । পরে কস্টিং পড়ার সময় অনেকে বলেছে যে গায়ের রং

এর জন্য ও কোনোদিন কর্পোরেট জগতে উচ্চপদে উঠতে পারবে না । অনেকে ওকে স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে যেতে বলেছে । অনেকে বলেছে গৃহবধূ হতে । যদিও বা কোনো সহৃদয় পাত্র ওকে বিয়ে করে । ওর বাপ্ ওকে শৈশব থেকেই বনে নানান পাখি ও ক্ষুদ্র পশু শিকার করতে শেখায় । যেমন শেখায় নানান গাছ গাছালির ভেষজ গুণ ।

পশুগুলিকে ধরে এক কোপে গলা কেটে দিতো বাবা ।

ওর বড্ড মায়া হতো । বাবা বলতো, এসব করতে শিখে নে । বাইরের জগৎ বড় কঠিন রে । আমি তো সর্বদা থাকবো না । তুই মেয়ে তায় কালো বরণ । লোকে গায়ে থুথু দেবে , হাত ধরে টানবে । নিজেকে শক্ত কর । তুলো অতসী হলে চলবে না ।

জেদ চেপে যায় ভ্রমরের । সে খুব জেদী মেয়ে । হলই বা গরীব ! বাবা বলে যে মানুষ টাকাপয়সায় গরীব বড়লোক হয়না । মনে গরীব হয় । কথায় গরীব হয় ।

কারণ টাকা দিয়ে নতুন করে জিনিস কেনা যায় কিন্তু কাউকে আঘাত করলে -- ভাঙা কাঁচ জোড়া লাগেনা বা একবার বাজে কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে তা আর ফিরিয়ে আনা যায়না । এসবের ফল হয়তবা মানুষের

চেতনাকে আঁকড়ে ধরে । সহজে যার হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলেনা ।

ভ্রমর পরে একটি কারখানায় বড় পোস্টে কাজ পায় । সেই কারখানার নাম খুশবু। তাদের কাজ হল ফুল থেকে সুগন্ধী তৈরি করা । আজকাল তো বাজারে অনেক নকল সুগন্ধী । কিন্তু অনেক আগে আতরের মতন সুগন্ধী পুষ্পরেণু ও পাপড়ি ইত্যাদি থেকে নির্যাস বার করে নিয়ে বিকিকিনি করা হতো । সেই ব্যাপারটা কাজে লাগিয়ে এই কারখানায় কাজ হয় । মালিক একজন আফ্রিকান । নাম রিচি বালোগান । সে মূলত অ্যাফ্রিকায় থাকে । ভারতের কাজ চালায় ভ্রমর । লোকটি আগ্রায় পড়াশোনা করেছে আর বিয়েও করেছে একজন ভারতীয় রসায়নবিদ্‌কে । ওদের বিরাট এই ব্যবসার সিংহভাগ দেখাশোনা করে ভ্রমর । কালো মেয়ে আজ এই ব্যবসাদারের একজন বিরাট ভরসার মানুষ ।

ওদের খুশবুর ওয়্যার হাউজের কাছে এক অরণ্য আছে । সেখানে একজন মানুষ এসেছিলো ভেষজ ওষুধ ও নানান শেকড়বাকরের সন্ধানে । স্থানীয় বনজ মানুষদের থেকে সব শিখে নিয়ে ; ওদেরই উৎখাত করে দেয় কারখানা তৈরি করে । সব জমিজমা কেড়ে নেয় । বন সাফ হয়ে যায় কারখানা বেড়ে ওঠায় । লোকটি নিজে নানান ভেষজ

চাষ করে এখন ওষুধ ও প্রসাধনী ইত্যাদি বানায় । বিশাল লাভ হয় তার ।

বন সাফের কারণে হৈ হল্লা হলে অনেক বৃক্ষরোপন করে বটে । তাতে অনেকে ওকে ক্ষমা করে দেয় । বলে , ভুল সবারই হয় কিন্তু আত্মগ্লানির অনলে ভুগলে তখন মন শুদ্ধ হয় । পরের বার এই কাজ করার আগে বহুবার ভাববে ।

****

আজ বাসায় ছোট্ট ঘরোয়া ডিনার । কিছু লোক আসবে তারা ওর সহকর্মী । একজন আছে যে কালো মেয়েকে বিয়েও করতে ইচ্ছুক । বলে, আই ডোন্ট সি ইওর বডি , আই সি ইওর সোল । রসিক ভ্রমর খিলখিলিয়ে ওঠে, কোনটা বাঁ পা না ডান ?

আজ মেনুতে কচি পাঁঠার হাল্কা ঝোল আর ঝরঝরে ভাত । গন্ধ লেবু দিয়ে ডাল, ভিন্ডি ভাজা , ফুলকফির সবজি,

বেগুন বাসন্তী , পেঁপের চাটনি ও পায়েস খাবে । খাসা বাঙালিয়ানায় ভরপুর উৎসব । নবরতন কোর্মা আর মটন রোগান জোশ থেকে অনেক দূরের সন্ধ্যা এটা ।

মস্তিস্কটা ভ্রমরের বরাবরই তীক্ষ্ণ আর মাংস কাটার হাতটাও । কাজেই আইডিয়াও ঐ দিয়েছে । লোকটি ওদের খুশবু ব্র্যান্ডের সাথেই যুক্ত । এথিক্যাল খুশবু আর আন এথিক্যাল ঐ ব্যবসা যার নাম খইরি ইনকর্পোরেশান দুটি পাশাপাশি কারখানা ।

লোকে ভাবে এতে রেষারেষি বাড়ে । আদতে এটা সুস্থ কম্পিটিশান । আর এতে খুশবুর লাভই হল ।খারাপ কাজের জন্য খইরির সেলস্ কার্ভ নিচের দিকে গেলেও খুশবুরটা ওপরের দিকেই উঠেছে।যদিও মালিক বালোগান কিংবা তার ভারতীয় রাঙা বৌটি সেটা জানেনা । কালো মেয়ে ভ্রমরের গাত্রবর্ণ দেখা গেলেও আর তাই নিয়ে লোকে বিদ্রুপ করলেও মনের রং কেউ দেখতে পায়না । আধুনিক জগৎ তা হয়ত চায়ও না ।

কোনো যন্ত্র যদিবা বারও হয় তা দেখাবার তাতে আধুনিক জগতের লাভের থেকে লোকসানের পাল্লাটাই বোধহয় বেশি ঝুঁকে পড়বে ।

তাই ভ্রমর, মনটা ওড়নায় জড়িয়ে আপাততঃ আছে বেশ ।

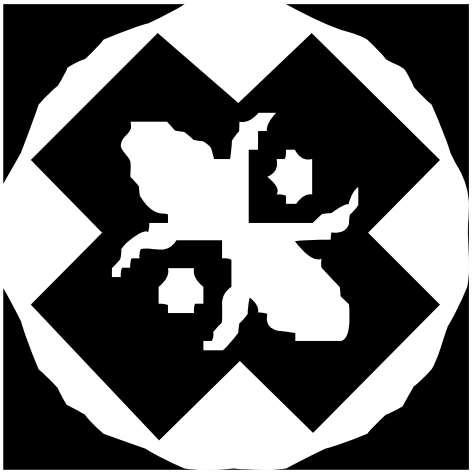

ঠগী

সেবি (**SEBI**) অফিসার যশোবর্দ্ধণ ঠাকুর ওরফে যশ হল এক বিরাট সম্মানীয় ব্যাক্তি । ওনার নামে লোকে সেলাম ঠোকে । ভারতের মতন দেশে যেখানে সততা অনেক কম, সেখানেও ওনার জন্য ব্যবসাদারদের বেজায় ভয় । শেয়ার বিকিকিনি , বেআইনি কোম্পানি দখল করা , কেনাবেচা সবই একটা সীমারেখায় বাঁধা থাকে এই মানুষটির দৌলতে । লোকে ওঁকে ভয় পায় যমের মতন । আবার নিন্দুকে বলে এঁর নজরে পড়া অনেকটা শনির সাড়ে সতির মতন । সহজে তার থেকে বার হবার কোনো উপায় নেই ।

যশের বর্তমান ঠিকানা দক্ষিণ ভারতের একটি গ্রাম ।

দেশের জন্য শহীদ হওয়া নানান মানুষের পরিবারের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করছেন তিনি । কখনো আখ চাষী মেয়েদের এই ফলন ফলাবার জন্য গর্ভাশয়ের অসুখ ও

জরায়ু বাদ দেওয়াকে নিয়ে কাজ করছেন , কোথাও বা ঋতু পরিবর্তন নিয়ে মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করছেন । কখনো খনি মজুরদের ঘর বাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে সুপার মার্কেট করে অফিসারদের সুবিধে দেওয়া তো কোথাও বা রং বেরং এর সুতো নিয়ে নক্সা কাটা পোশাক তৈরি করা দর্জিদের কাজের মূল্যায়ন করে তাদেরকে সমাজে গুরুত্ব দেওয়া- বিদেশি আজেবাজে চটুল ,সস্তা তন্তুর থেকে এসব সমাজিক বিষয়ে সময় দেওয়ার জন্যই তাকে পাওয়া যায় । ২৪/৭ এই মানুষটি দেশের জন্য, দশের জন্য প্রস্তুত থাকেন । বয়স হবে তা ৬৫/৬৬ বছর ।

উচ্চতা ৫ফুট দশ ইঞ্চি । খুব ফর্সা । এতটাই যে গলা ও কান একদম লাল টকটকে । গোরা চমড়া কাতর ভারতীয়দের কাছে খুবই আকর্ষণীয় । ভদ্রলোকের চোখ দুটো খুবই বাঙ্ময় । না বলেই অনেক কথা বলতে পারে । পলাশ ফুলের পাপড়ির মতন বড় বড় দুটি চোখের একটি অবশ্যই সাইজে একটু ছোট ও মণিটি আশ্চর্যভাবে বাদামী ! অন্যটি ঘন কালো । কিন্তু এতেই যেন ওঁকে আরো সুন্দর ও গভীর লাগে ।

আলাদা একটা গাম্ভীর্য ওনার অবয়বকে ছুঁয়ে যায় ।

মাথা ভর্ত্তি কালো , কোঁকড়া চুল এখন অনেকটাই পাতলা ও রূপালি । কপাল চওড়া মনে হয় তার জন্য ।

চোখা নাক । চওড়া ছাতি ও কব্জি । বিবরণ শুনে মনে হবে ওনার এখনও তো এনফোর্সমেন্ট এই থাকা উচিৎ কিন্তু উনি এরকম পুরোদমে সমাজ সেবায় কেন ?

তাও পরিবারকে সময়ই দেননা মোটে ?

যমজ সন্তান আছে নাকি । তাদের কথা কেউ জানেনা । মানে তারা কোথায় থাকে বা তারা কে ।

ওনার স্ত্রীকেও কেউ দেখেনি ।

লোকে ভাবে হয়ত বা উনি অসূর্যম্পশ্যা । কিংবা বিবাহ বিচ্ছিন্না !

****

ভদ্রলোক সেবি অফিসার হলেও বেশ নামী ও পপুলার । একটা ক্যারিজ্মা আছে । রূপবান হলেই তো হয়না লোকের মনে স্থান করে নেবার জন্য এই গুণটি বিশেষ দরকার । তাই উনি যেখানেই যান যেন কস্তুরী মৃগর মতন আতর ছড়িয়ে আসেন ।

যশোবর্দ্ধণ ঠাকুর আদতে জমিদার বংশের মানুষ তবে দুয়োরাণীর পুত্র । বাপের তৃতীয় স্ত্রীর একমাত্র ছেলে ।

ওনার বাবার তিন স্ত্রী । তিনজনই মৃতা । তিনজনেরই তিনটে ছেলে । তিনজনের নামই যশোবর্দ্ধণ । সেই রাজা পুলকেশী এক , দুই এর মতন এরাও এক, দুই আর তিন ছিলেন ।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তিন নম্বরের ভাগ্যে আর কিছু জোটে না । তাই সারাটা জীবন ওনাকে চাকরি করেই খেতে হয় । জমিদারীর আনন্দ নিতে সক্ষম হননা ।

কৈশোরে বাড়ি থেকে পালিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি আশ্রয় নেন । সেখান থেকে দুই বন্ধু এই সেবির চাকরি জন্য পরীক্ষা দেন কিন্তু বন্ধুটি বিফল হয় । তবুও তার পরিবার কিন্তু যশোবর্দ্ধণকে হেনস্তা করে না । বরং তারা ওনাকে নিজেদের ছেলের মতনই ভেবে ওনার সাফল্যে ভাগ নেন । ওর সেই বন্ধু অবশ্যি আজ প্রফেসারি করে।

যশোবর্দ্ধণ আবার বক্সিং চ্যাম্পিয়ন । একটা সময় পেশাদার খেলাতেও অংশ নিয়েছেন । সবসময় ভাবতেন

এমন মেয়ে বিয়ে করবেন যে বেশ ডানপিটে । হয়ত তাই বিয়েও হয়েছিলো তনুজা ব্রাউনের সাথে । মেয়েটি কেরালার মেয়ে । ওর বাবা একজন শেয়ার মার্কেটের মানুষ । ডুবাইতে থাকতেন । যদিও দক্ষিণী মানেই সবাই গাল্ফবাসী কিংবা রজনীকান্তের ফ্যান বা দোসা/ইডলী খায় এসব মানতে রাজি ছিলেন না। কারণ উনি নিজে মামুট্টির ফ্যান, প্রিয় খাবার আপ্পাম ও স্ট্যু আর ওনার বহু আত্মীয় আমেরিকা ও ইউরোপে আছে ।

যাইহোক এই ভদ্রেলোকের একমাত্র কন্যার সাথে বিয়ে হয় যশোবর্দ্ধণের । ওনার পত্নী জামাইকার মেয়ে টিগান । পেশায় একজন সিন্থেটিক বায়োলজি ও Artificial Intelligence এর মানুষ । ওদেরই মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন যশোবর্দ্ধণ ।

মেয়েটি সত্যি দারুণ সাহসী । Aerobatics পাইলট ছিলো । নানান প্রতিযোগিতায় অংশ নিতো । দেখতেও মন্দ নয় । চটকদার চেহারা । একটু পুতুল পুতুল ।

তবে মানবীর মতন নেগেটিভ গুণ সম্পন্নাও । হিংসা, ক্রোধ , লালসা মুক্ত নয় । দিন ভালই কাটছিলো মধুচন্দ্রিমা শেষ হবার পরেও । কিন্তু দিন তো একরকম যায় না । জীবনের অর্থ হল কম্পন । কখনো বেশি কখনো বা কম । যশোবর্দ্ধণের জনপ্রিয়তা , মাচো

চেহারা ও ব্যাক্তিত্বপূর্ণ প্রেজেন্স দেখে অনেক নারী ভক্ত আসে ফেসবুকে । তাতে তনুজা কন্ট্রোল ফ্রিক্ হয়ে ওঠে ও নিয়মিত ওনার ফোন চেক্ করতে শুরু করে ।

কাজেই মৃদু থেকে ভীষণ কম্পনের সৃষ্টি হল ।

যখন তনুজা মা হল তখন আরেক সমস্যা হল । যমজ সন্তান আসছে । সংসারে সুখের ছোঁয়া । কিন্তু সেই সুখের তরী বেয়েই এলো দু:খ ! টুইন শিশু দুটিকে নিয়ে আনন্দের রেশ সবার মধ্যে কিন্তু সে দুটি আসলে দুটি ব্যাঙ ! যেই স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার পরে ভালোবাসার খাতিরে আলতো করে যোনি স্পর্শ করতেন ও জানতে চাইতেন --- হ্যাভ আই ফাক্ড ইউ হার্ড বেবী ? সেই পতিদেব একবারও পত্নীর কাছে এসে তার কুশল জিজ্ঞেস করলেন না । এমনই দু:খের বাতাস চারদিকে । কারণ তনুজা আদতে ওরই মায়ের সৃষ্ট এক কৃত্রিম মানবী মানে রোবট যে সিন্থেটিক্ বায়োলজির কেরামতিতে জন্ম নিয়েছে । সে নিজে সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম । ফ্রগ স্টেম সেল থেকে তৈরি এই বট্ গুলি ব্যাঙ বাচ্চার মা হতে পারে । আর হলও তাই ।

সৎ ও কর্মঠ এনফোর্সমেন্ট অফিসার বলে পরিচিত যশোবর্দ্ধণের যশ তো বর্দ্ধিত হল না এই ঘটনায় বরং অনেক অনেক নিচে নেমে গেলো । সেটা কেবল মন্ডুকের জনক হিসেবে নয় একজন ঠগের জামাতা হিসেবে । অন্যের ঠগ ও জালিয়াতি ধরা যশ, বিরাট এক চক্রান্তের শিকার । মেল ইগোতে লাগলো ।

--আমি জীবনে কাউকে ঠকাইনি অথচ আমাকে আমার জীবনের সবচেয়ে ভালনারেবেল জায়গায় আর মোমেন্টে এইভাবে ঠকিয়ে নিলো ?

বুকের ভেতরে হাহাকার ।নেশায় ডুবে গেলো । সেদিন ছিলো আড্ডা । বন্ধুদের বলতো , আমি নিশ্চয় মস্ত মস্ত সব পাপ করছি রে তাই আমার একটা মানুষ বৌও জুটলো না ! আই জাস্ট কেপ্ট অন্ হ্যাভিং সেক্স উইথ আ ডিজিট্যাল বিং ! অ্যান্ড আই নেভার সাস্পেক্টেড্ ! অ্যান্ড দেন আই হ্যাড্ অল্ দিস্ ফ্রগ স্টাফ্ কামিং আউট অফ্ হার -----ওহ্ শিট্!

****

নিজেকে মানুষের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছেন কেবল একাকীত্ব ভোলার জন্য নয় । মানুষ খুঁজে পাবার জন্য । কারণ ঐ ঘটনার পর থেকে নাকি নিজের মনুষ্যত্ব নিয়ে সন্দেহ হতো ! মাঝে মাঝে রাত্রে চীৎকার করে ঘুম থেকে জেগে উঠতেন --- নিজের গায়ে চাকু দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেখতেন তাজা রক্ত বার হচ্ছে কিনা ।

বন্ধুদের বলতেন, দেখ্ তো আমার গায়ে তার ফার দেখা যাচ্ছে কিনা ? আরে আমার চার্জার টা কোথায় ? হারিয়ে গেছে নাকি ?

অনেকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে বলে । কিন্তু সেটা তো কোনো সমাধান নয় কারণ সন্তান প্রসব করতে সক্ষম রোবট তো সমাজে আসছে ! কাজেই একে কি আর অসুখ বলা যায় ?

হোম স্টে

মিজোরামের, নীল ঘূর্ণী পাহাড়ের এক বিখ্যাত হোম স্টে তে থাকে হুসেন ঋষি । ভদ্রলোকের বাবা হিন্দু ও মা মুসলিম বলে এমন নাম । লোকে ওকে খত্‌নাওয়ালা বলে ব্যঙ্গ করেছে অনেক যদিও ও আদতে হিন্দুই । ও অবশ্যি বলেছে যে এতে পুরুষাঙ্গ জনিত অসুখ কম হয় । কিন্তু টিটকারি তো গায়ে লাগেই ! ও অবশ্যি হুসেন বানান লেখে **Whosane ---- !** আর ঋষি হল ওর পদবী । তো এই ভদ্রলোক একজন আয়রনম্যান । বিশ্ব বিখ্যাত মানুষ । আগে থাকতেন শহর কলকাতায় । কিন্তু এখন মিজোরামের আইজলের কাছে থাকেন । এই

হোম স্টে বিখ্যাত থেকে অখ্যাত হয়ে গেছে ওর কারণে । কারণ এই নিবাসের মালকিন, মিসেস মৈতেই লালরং (এর নাম মৈতেই হলেও পদবী লাল আর তারপর খুব কঠিন কিছু একটা যার শর্টকাট করেছে হুসেন লালরং বলে । বেশ সুরেলা শুনতে লাগে জিনিসটা । মনে মনে যেন গুনগুনিয়ে ওঠে ঋষি সেই পুরনো বলিউডি গানের কলি ,

--ইয়ে লাল রং কব মুঝে ছোড়ে গা !

আসলে এর পেছনে একটা করুণ গল্প আছে যেটা শোনাবার জন্যই আমি লিখতে বসেছি । হুসেন বলে, এখন মৃত ব্যাক্তিরা বায়বীয় দেহ নিয়ে আমাকে নিয়ে কবিতা লেখে !

হুসেন ঋষি খুবই চমৎকার ও সুঠাম দেহের এক মানুষ ছিল । কৈশোর থেকেই ভারোত্তোলন চর্চা করে ও পরে আয়রনম্যানের প্রতিযোগিতায় যোগদান ও বিজেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে যথেষ্ট সুনাম কুরায় । একজন ভারতীয় রূপে সমাজে আদৃত হয় ।

ছোট থেকেই ওর ইচ্ছে ছিলো এমন একজনকে জীবন সাথী রূপে গ্রহণ করবে যে ওর আত্মার অংশ হবে ।

যাতে স্ত্রী যখন দৈহিকভাবে কাছে থাকবে না তখন তার আত্মা ওর সাথে থেকে যাবে ।

ভদ্রলোক খুব চিন্তাশীল ও রোমান্টিক মানুষ তা বেশ বোঝা যায় ।

এখনও এই বয়সেও বেশ মানুষ । রং চং-এ পোষাক পরতেই বেশি ভালোবাসে । মাথায় সব সময় একটা লম্বা বেণী বাঁধা । তাতে রঙীন ফিতে লাগানো ।

ডান হাতে ভীষণ মোটা একটা রাজস্থানী রূপার বালা । পায়জামা ও কালার্ড টি-শার্ট বেশি পরে ।

চালসের চশমা ছাড়া অন্য চশমা নেই । পেটানো চেহারা । তামাটে রং । চওড়া কবজি । উল্কি বিহীন দেহ ।

--ট্যাটু জিনিসটা বরদাস্ত হয়না । সারা দেহে এত ডিজাইন করলে আসল মানুষটা হারিয়ে যায় , বলে হেসে ওঠে হুসেন ।

ভদ্রলোকের প্রথম বসন্ত এসেছিলো এক রূপসী নারীর কল্যাণে অনেক বছর আগে । কিন্তু তারা ছিলো নি:সন্তান । এরপরে ভদ্রমহিলা ক্লাব আর পার্টি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে যায় । হুসেন নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে । আয়রনম্যান ছাড়াও ছিল এক সফল ব্যবসায়ী ।

আসলে শিখেছিল কাঠের কারুকার্য ।

জাপানী Netsuke শিখেছিল আর সেই নিয়ে কাজ করেছিল পরে । তাকেই একটু ঝেড়ে পুছে নিয়ে চামচের ভাস্কর্য শুরু করে । এতরকমের চামচ যে কাঠের ওপরে হতে পারে না দেখলে বোঝা দায় ! কেউ কিনে নিয়ে খেতো ওটা ব্যবহার করে , কেউ কিনে নিয়ে এক্সিবিশন করতো, কেউ ঘর সাজাতো আবার কেউবা উপহার হিসেবে বেছে নিতো । অপরূপ সেইসব বস্তু বা চামচ শিল্প । ভালই উপার্জন করতো । কাজেই ওর স্ত্রীর ওপরতলায় ভালো পরিচিতি ছিলো । ভদ্রমহিলা প্রচন্ড কামে আসক্ত হয়ে পড়ে । লোকে মদ, মাদক অথবা শপিং/গহনা ইত্যাদিতে আসক্ত হয় কিন্তু ইনি অসম্ভব কামের কামড়ে কাহিল হয়ে পড়ে ।

- সারাদিন সেক্স করতে চাইতো । ভাবখানা ছিলো যেন আমি কাজকম্মো ছেড়ে সারাদিন ওর সাথে সেক্স করি । বলতো, তুমি তো আয়রনম্যান , বেশ বলশালী । পারোনা আমাকে এমন কিছু করে শান্তি দিতে যাতে আমি কামের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়ি ।

  ওর এই উদ্ভট কান্ড দেখে আমি খুব অবাক হতাম কিন্তু ভাবতাম ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে

যাবে । হয়ত একাকীত্বে ভুগে এমন হয়েছে । কোনো সন্তান নেই আমাদের । ওকে বলেছিলাম আমরা একটা শিশুকে লালন পালন করতে পারি । কিন্তু আমার যথেষ্ট সময় ছিলো না । আর ও একা এতবড় দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে । পরে ও চলে গেলো একটা আধুনিক ক্লাবে । যা ব্যবসাদারদের বিবিরা চালায় । নাম সেলেসিয়াল । ওখানে নাকি অ্যাস্ট্রাল সেক্স হয় । সেলেসিয়াল বিংস্ দের সাথে সেক্স করানোর পন্থা শেখানো হয় । ধ্যানের মাধ্যমে নিজের ভাইব্রেশান কমানো বাড়ানো ইত্যাদি করে ওখানে সেলেসিয়াল বিংস্দের সঙ্গে রমণের ব্যবস্থা করানো হয় । মানুষ ওখানে যায় নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে । এতে গর্ভবতী হবার সমস্যা নেই, এস-টি-ডি হয়না আবার লোকলজ্জার ভয় নেই । যতখুশি নারী বা পুরুষ সঙ্গ করলেও কেউ জানতে পারবে না । নিজের বিয়ে করা বৌ ওসব ক্লাবে যাবার পরে আমাকে রাতে বলতো, হ্যাঁ গো তুমি তো আয়রন ম্যান , কী সব সরু জিনিস ইন্সার্ট করছো আরাম লাগছে না । পারোনা ওদের মতন, ঐ বিংস্ দের মতন অ্যাস্ট্রাল থেকে বড় বড় ট্যাঙ্কস্ বা

একে ৪৭ নিয়ে আসতে ? উহ্ ! কি যে আরাম লাগে যখন সেলেসিয়াল সেক্স করি !

একবার কষে এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিই ! তাতেই বিপত্তি । আত্মসম্মানে আঘাত লাগে । আইনত: বিচ্ছেদ হয়নি কিন্তু আমরা আর একসাথে থাকিনা । আমার সব সম্পত্তির অর্ধেক মালিক ও । সেসব বদলাইনি । কোথায় যাবে ? একধরণের উন্মাদই ভাবি ওকে । শেষের দিকে স্বামী হিসেবে সেক্স করার জন্য নানান দামী দামী জিনিস নিয়ে নিতো দাবী করে করে । বলতো যে আমি নাকি ওকে যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারিনা । আর ও বিছানায় মরা ব্যাঙের মতন পড়ে থাকতে পারবে না । ও হয়ত সন্তান প্রসবের মেশিন হতে পারেনি কিন্তু অর্গ্যাজমের অধিকার ওর আছে ।

মুখে একটু বেদনার আভাস । বৌয়ের জন্য বেদনা । আবার বলে ওঠে, আসলে ও কিন্তু আগে একজন ফিলোসফার ছিলো । সাংখ্য দর্শন নিয়ে গবেষণা করে ছিলো । বলতো, অদ্বৈতবাদের জনক শঙ্করাচারিয়া ওয়াজ আ ফুল । ওর তত্ত্ব মহাপ্রলয়ের পরে প্রযোজ্য । যখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা । আর যতদিন

সৃষ্টি থাকে ততদিন দ্বৈতবাদই চলে । আরও বলতো যে নারীদের সবাই সেক্স অবজেক্টই মনে করে । তাদের সাফল্যে পুরুষ ভয় পায় আর ঈর্ষান্বিত হয় । ওদের ডোরম্যাট হিসাবেই দেখতে পুংলিঙ্গ বেশি স্বচ্ছন্দ । তাই ওর মনে হয় যে মেয়েদের জন্য সবথেকে ভালো জীবন ধারণের উপায় হল কোনো ধনী ও পাওয়ারফুল ব্যাক্তির মিস্ট্রেস হয়ে যাওয়া । ফাঁক ও ফাক্ । আমি তো অত ফিলোসফি বুঝিনা তবে আমার মনে হয় সি ওয়াজ আ গডড্যাম্ড্ ব্রিলিয়্যান্ট ফিলোসফার কিন্তু একটু ক্র্যাক্ । ওর মধ্যে একটি নয় অনেকগুলি মানুষ একইসঙ্গে বাস করে । নানান সময় তারা মুখ দেখায় ।

প্রথম প্রথম এই উত্তর পূর্ব ভারতের এইসব এলাকায় ঘুরতে আসতাম । এই মিজোরামে আমার কিছু বন্ধু ছিলো সেখানে এসেই এই রাজ্যের প্রেমে পড়ি । তারপরে হোম-স্টে গুলোতে থাকতে শুরু করি । সব থেকে বেশি থাকতাম এই মৈতেই এর হোম-স্টে তেই । কারণ আমি একনাগাড়ে বহুদিন ধরে এইসব জায়গাগুলোতে থাকি । এখানে আসতে

আসতেই নিজের আত্মার এক অংশের সন্ধান পাই যদিও অনেক দেরী হয়ে গেছে ।

দূরের পাহাড়ে রং লেগেছে । লেবুপাতার মতন রং আর হাল্কা কুয়াশা । মৈতেই এসে পাশে বসলো । ওর দুই কন্যা শহরে কাজ করে । মহিলার হোম স্টেতে এখন একজনই খদ্দের !

হুসেন ঋষি । ভদ্রলোক মাঝে মাঝে কলকাতা যান ব্যবসা দেখতে । স্ত্রী মরালি সেপারেটেড্ । তাকেই প্রতিমাসে টাকা পাঠান কিন্তু সম্পর্ক নেই একবিন্দু ।

অতীতে একদিন সকালে একটা এস-এম-এস পান । কেউ ওকে লেখেন--- **আই হ্যাভ ফাক্ড্ ইওর ওয়াইফ্ । হাউ আর ইউ ফিলিং মিস্টার আয়রন ম্যান ?**

সাধারণত: অন্য কারো মেসেজ হলে অতটা গুরুত্ব হয়ত দিতেনও না কিন্তু ওটা এসেছিলো

ওরই রাইভাল অন্য এক প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর চমন পাপাদিমিত্রুর কাছ থেকে !
ইগোতে লাগে আসলে । গা জ্বলে যায় ।
স্ত্রীর মুখ দর্শনও করেন না আর ।
সেই থেকেই আলাদা ওরা । মহিলা এত কাম প্রেমী যে স্বামীর সাথে সেক্স না হলে তাকে কিচেনের বাসন পত্র ছুঁড়ে মারতেন । কিন্তু স্বামী তাকে আনন্দ দিতেও অক্ষম !
যেই তান্ত্রিক গুরু ওদের সেলেসিয়াল ক্লাব চালান তার আবার নানান আখড়া আছে । এখন নাকি সেখানে কোথাও ঠাঁই পেয়েছে ওর বৌ ।

মৈতেই পতিহীনা রমণী এবং খুবই কোমল প্রকৃতির । যত্নশীলা ও ঠান্ডা মেজাজের । হোম স্টে সেইকারণেই বেশি চলতো । লোকে নানান সুখের দু:খের কথা বলতো এসে । মহিলা অংশ নিতেন । নিজের জীবনের নানান অভিজ্ঞতা শোনাতেন । উপদেশ দিতেন । সৎ পরামর্শ যাকে বলে কিন্তু কারো বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নি ।
আজকাল তো প্রেমও লোকে কোনো না কোনো মতলবে করে ! হয়ত তাই মানুষের ঢল নামতো

ওর গৃহে । লোকে সুন্দর ব্যবহার পেতো । কিন্তু এখন এই হোম স্টের একজনই গেস্ট । হুসেন ঋষি ।

--আসলে আমাদের নিজেদের প্রিডিকামেন্ট থেকে বার হতে হবে যে দুনিয়ায় সবাই মন্দ বা বাজে কাজে চারদিক ছেয়ে গেছে ইত্যাদি যা টিভি সিরিয়াল আর ফেক্ নিউজ মিডিয়া শেখাচ্ছে । জগৎটা ঘুরে দেখো , দেখবে হুসেন ঋষির মতন মানুষ আছেন ---

--আর মেইতেই আছে , উচ্চস্বরে বেণী দুলিয়ে বলে ওঠে হুসেন ঋষি ।

পড়ন্ত বেলায় আর্থিক ভাবে সফল হুসেন হিসেব করে না ওর আস্তাবলে কটা স্পোর্টস কার আছে কিংবা ডিজাইনার ঘড়ি আছে অথবা এই বয়সেও কোন সে রূপসী এমন লৌহমানবের সাথে স্ট্রীপিং ও বুজ করতে আগ্রহী বরং সে এতেই খুশি যে ওর মৈতেই আছে আর মৈতেই এর ও আছে !!

ভদ্রলোক বলে ওঠে , তন্ত্র কি তা আমিও জানি । আমি নিয়মিত ত্রাটক মেডিটেশান করি ।
তন্ত্র এর অর্থ হল অন্যসব আধ্যাত্ম বিদ্যার মতনই ভগবৎ/বতীকে জানা । এইসব নোংরামো করা নয় । আর আজেবাজে আত্মার খপ্পড়ে পড়লে তা জন্মজন্মান্তর ধরে পিছুধাওয়া করতে পারে । এগুলো ছেলেখেলা নয় । প্রকৃতি যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে আর মানুষ যুগ যুগান্ত ধরে মেনে আসছে আমার মনে সেগুলো করাই ভালো এইসব নষ্টামি না করে । কারো যদি এতো কামের কামড় লাগে যে নিজ স্বামীতেও সে সন্তুষ্ট নয় তাহলে হয় তার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিৎ নয়ত স্বামীকে ছেড়ে অন্য কিছু সুস্থ ব্যবস্থা করা উচিৎ ।

ভদ্রলোক এতক্ষণ কার সাথে কথা বলছিলেন বোঝা গেলোনা । কারণ এতসব কথাকলি শোনার পর দূরের পাহাড়ের কিছু পাহাড়ি ময়না উড়ে গেলো মাত্র আর বনফুলের ঝাড় হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে নুইয়ে পড়লো সবুজ ঘাসের গালিচায় ।

চাঁদের মধুরিমা মেখে অনেকে হয়ত ঘনিষ্ঠ হয় কিন্তু হুসেন ঋষি তার আত্মার অংশকে এই রাতটা উপহার দিলেন যেমন মৈতেই ওকে দিল এক আঁজলা পথভোলা মেঘ ।

এখনও, এই বয়সেও নাকি উনি এই বিশেষ বন্ধুর রক্ত মাংসের শরীরে, প্রতি রাতে ডিনারের পরে- একটি খসে পড়া পাখির সোনালি পালক দিয়ে অসংখ্য লাভ সাইন এঁকে দিয়ে থাকেন ।

--নীল নির্জনে !

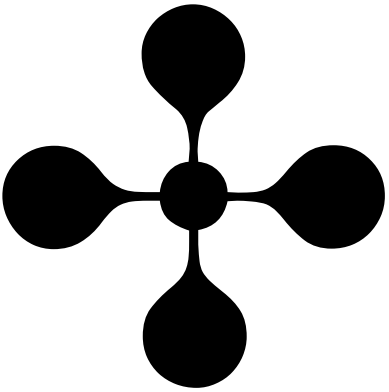

The End